মায়াবন বিহারিণী

যোবায়েদ আহসান

তাম্রলিপি

মায়াবন বিহারিণী
যোবায়েদ আহসান

গ্রন্থস্বত্ব : শাকিলা ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি :.....

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
শাখাওয়াৎ সবুজ

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩৫০.০০

Mayabon Biharini
By : Jobaed Ahsan
First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 350.00 $12

ISBN :.....

উৎসর্গ

হুমায়ূন আহমেদ স্যারকে

হঠাৎ হুমায়ূন আহমেদ এসে হাজির আমার সামনে।

তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, স্যার আপনি?

উনি বললেন, এভাবে চমকে ওঠার কী হলো? আমি কি ভুত নাকি?

আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না।

একজন মৃত লোক আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি কি ভুত নাকি? –এর উত্তরে অবশ্যই বলা উচিৎ, জি আপনি ভুত।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদকে এই উত্তর দেয়াটা বেয়াদবির পর্যায়ে পড়ে। এমন বেয়াদবি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, না। আপনি হুমায়ূন আহমেদ। ভুত দেখে না চমকানোটা সম্ভব হলেও, আমার পক্ষে আপনাকে দেখে না চমকানোটা অসম্ভব।

এমন তোষামোদী কথাবার্তায় তিনি আগে কখনো খুশী হতেন না।

কিন্তু আজ কেন জানি মনে হলো আমার কথায় তিনি বেশ খুশী হয়েছেন। কারণ তাঁর মুখে একটা প্রসন্ন ভাব দেখা গেলো।

বুঝলাম, পরকালে তোষামোদ করে কথা বলার লোক মনে হয় খুব একটা পাওয়া যায় না।

আমি বললাম, স্যার ওপারে কেমন আছেন?

উনি বললেন, আছি মোটামুটি ভালোই। শুধু একটা বিষয়ে মন খারাপ।

আমি বললাম, কোন বিষয়ে স্যার?

তিনি বললেন, আমি জীবনে এতোগুলো বই লিখলাম। এতো লোককে এতো সুন্দর সুন্দর কথা লিখে উৎসর্গ করলাম। এমনকি সেইসব উৎসর্গ পত্র দিয়ে আবার কে যেন 'নির্বাচিত উৎসর্গপত্র'ও বের করে ফেলেছে দেখলাম। অথচ আজ পর্যন্ত দুটো ভালো কথা লিখে আমাকে কেউ একটা বই উৎসর্গ করলো না?!

আমি বললাম, স্যার। যতদূর মনে পড়ে হুমায়ুন আজাদ তো আপনাকে একটি বই উৎসর্গ করেছিলেন।

আমার কথা শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বইটার নাম জানিস?

আমি বললাম, না স্যার। মনে করতে পারছি না।

তিনি বললেন, 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'। ফাজিলটা এই নামে বই লিখে উৎসর্গ করেছে আমাকে আর মিলনকে। এইটাকে উৎসর্গ বলা যায়, বল তুই?

আমি বললাম, না স্যার। বলা যায় না।

তিনি বললেন, এই যে বইমেলা আসছে। কত শত বই বের হবে। কতজন কতজনকে উৎসর্গ করবে। অথচ একজনেরও আমার কথা মনে পড়বে না– এটা কোন কথা?

স্যারের কথা শুনে আমি বেশ দুঃখ পেলাম। নাহ, আসলেই তাঁর মতো মহান লেখকের প্রতি এটা একটা বিরাট অন্যায় হয়ে গেছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, স্যার, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যদি কোনদিন বড় লেখক হই, আপনাকে একটা বই উৎসর্গ করবোই করবো। আপনি শুধু আমাকে একটু দোয়া করে দেন, যেন আপনাকে উৎসর্গ করে বই ছাপানোর মতো যোগ্য লেখক হতে পারি।

ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে তিনি খুশী হয়ে যাবেন।

কিন্তু তাঁকে আগের চেয়েও বেশি হতাশ মনে হলো।

খুব সম্ভবতঃ বড় লেখক হবার জন্য দোয়া তিনি অপাত্রে ফেলতে রাজী নন।

নিশ্চয়ই তিনি এখন মনে মনে বলছেন, গাধার বাচ্চা গাধাটা বলে কী? বড়লেখক হওয়া এতোই সস্তা?

একটা মরাবাড়িতে বসে বসে আমি বাংলা ভাষার বিচিত্রতা নিয়ে ভাবছি।

বাংলা ভাষাটা আসলেই বেশ অদ্ভুত।

যেকোনো স্বাভাবিক ভাষায় 'মরাবাড়ি' বলতে কী বোঝাবে? যে বাড়ির মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ বাড়িটা মৃত। ইংরেজিতে– ডেড হাউজ।

কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় 'মরাবাড়ি' বলতে বোঝায় মৃত ব্যক্তির বাড়ি। ইংরেজিতে– ডেড মেন'স হাউজ। অদ্ভুত না ব্যাপারটা?

তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হলো একটা 'ডেড মেন'স হাউজে' বসে আমি বাংলা ভাষার বিচিত্রতা নিয়ে ভাবছি।

ভাবছি কারণ এখানে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই। মরাবাড়ি সাধারণত শোকের জায়গা। কিন্তু আমি যে এখানে খুব বেশি শোকে কাতর হবো সেই উপায়ও নেই– কারণ যিনি মারা গেছেন তাঁকে আমি ভালো করে চিনিই না। শুধু তার নাম শুনেছি। তিনি আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুর।

মাঝে মাঝে বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়লে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের শ্বশুর মারা গেলেও যেতে হয়– ভদ্রতা রক্ষার্থে কিংবা ঋণ শোধ করতে। আমিও সে রকম একটা বিশেষ কারণেই এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।

আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন আমার ছোটো খালা।

আজ সকালে মেসে শুয়ে শুয়ে আমার পরবর্তী উপন্যাসের প্লট নিয়ে ভাবছি। প্লট মাথায় আসছে না। সামনে বইমেলা। মেলায় একটা একটা নতুন বই বের করতে না পারলে লেখক হিসেবে মান-ইজ্জত থাকবে না।

অবশ্য লেখক হিসেবে ইতোমধ্যে আমার যে খুব একটা মান-ইজ্জত আছে ব্যাপারটা তেমনও না। এ পর্যন্ত আমার চারটা উপন্যাস বের হয়েছে– তাদের কোনোটাই মান ইজ্জত পাবার লেভেলে পৌঁছায় নাই।

অবশ্য ফেসবুক লেখক হিসেবে আমার জনপ্রিয়তা আছে। কিন্তু ফেসবুক স্ট্যাটাস এখনো সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় নাই। যদিও

আমার ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই ফেসবুক বা বিভিন্ন ব্লগের লেখালিখিকে সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এমনকি এসব জায়গায় লেখালিখি করে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারে কেউ কেউ। কিন্তু আপাতত সেই আশা নেই।

তাই, ফেসবুকে নিয়মিত স্ট্যাটাস লেখার সুবাদে বেশ কিছু ফলোয়ার জমলেও আমার বইয়ের তেমন কোনো পাঠক-শ্রেণি এখনো তৈরি হয়নি। আমার বইগুলো শুধু আমার ফেসবুক ফলোয়ারদের মাঝেই সীমাবদ্ধ আছে।

হ্যাঁ, কয়েকটা টিভি নাটকও লিখেছিলাম আমি, যার মধ্যে দু-তিনটে বেশ হিটও হয়েছিলো। কিন্তু টিভি নাটক হিট হলে লেখকের নামডাক হয় না, নামডাক হয় পরিচালক আর অভিনেতা অভিনেত্রীর।

তাই একজন লেখক হিসেবে তন্ময় তমালকে এখনো কেউ তেমন একটা চেনে না।

এ অবস্থায় যখন আমি যখন মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, লেখালিখি ছেড়ে দিয়ে চাকরিবাকরি খোঁজা শুরু করবো, এমন সময় আমার প্রকাশক সাফায়েত ভাই বললেন, তমাল এভাবে হাল ছেড়ে দিও না? তোমার মাঝে প্রতিভা আছে। সেটাকে এভাবে ধ্বংস করো না।

আমি বললাম, না সাফায়েত ভাই, এভাবে হবে না আমাকে দিয়ে। পেট না চললে সাহিত্য করবো কী দিয়ে?

সাফায়েত ভাই বললেন, আরে লেখকদের অভাবী হতে হয়। লেখকের পেটে যত খিদে মাথায় তত সাহিত্য। নজরুল, সুকান্ত, লালন, জীবনানন্দ এরা সবাই ছিলেন অভাবী। লেখকের জীবনে অভাব হলো আশীর্বাদ। তুমি আজ পর্যন্ত কোনো জমিদারের ছেলেকে লেখক হতে দেখেছো?

সাফায়েত ভাই সবসময় রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। একজন সাহিত্য প্রকাশকের কথায় রেফারেন্স থাকলে বেশ ভারিক্কি আসে। কিন্তু উনার জমিদারের ছেলের রেফারেন্সে একটা বড়ো ধরনের ভুল আছে।

সেই ভুলটা ধরিয়ে দিতে আমি বললাম, জি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথকে।

সাফায়েত ভাই একটু থমকে গেলেন। আমার ধারণা উনি মনে মনে ভাবছেন, ধুর, এটা কী করলাম? রবি ঠাকুরের পয়েন্টটা মিস করা উচিৎ হয় নাই।

অল্প একটু সময় ভেবে উনি বললেন, আরে রবি ঠাকুর হলেন এক্সেপশনাল কেইস। তুমি চাইলেই তো আর রবি ঠাকুর হতে পারবে না। ধরো তোমার জন্ম হলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। তা হলে কি তুমি রবি ঠাকুর হতে পারতে? পারতে না।

আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করে বললাম, না পারতাম না।

তিনি বললেন, তা হলে? এত তাড়াতাড়ি হতাশ হলে চলবে?

এই বলে তিনি আবারো একটা রেফারেন্স দিয়ে বললেন, তুমি কি ভ্যান গগের কাহিনি জানো না? কাফকার কাহিনি জানো না?

ভ্যান গগ বা কাফকা দুজনের কাহিনিই আমি জানি।

ভ্যান গগকে বলা হয় 'ভুল বোঝা প্রতিভা'। বেঁচে থাকা অবস্থায় তাঁর একটি মাত্র চিত্রকর্ম বিক্রি হয়েছিলো। অথচ ৩৭ বছর বয়সে নিজের পেটে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার পর তাঁর আঁকা ছবিগুলোকেই আজ অর্থ দিয়ে মাপা দুঃসাধ্য একটি বিষয়।

কাফকার কাহিনিও প্রায় একই রকম। জীবদ্দশায় কেউ তাঁকে লেখক হিসেবে চিনতই না। অথচ অকালে মারা যাবার পরে কাফকা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখকদের একজন হিসেবে।

তবে সেই মুহূর্তে ভ্যান গগ বা কাফকাকে নিয়ে আমি চিন্তিত না। আমি চিন্তিত সাফায়েত ভাইকে নিয়ে? এই দুজনের রেফারেন্স দিয়ে উনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন? আমাকেও কি অকালে মরে যেতে বলছেন নাকি?

সাফায়েত ভাইকে সুবিধার লোক মনে হচ্ছে না। দ্রুত তার থেকে বিদায় নেয়া দরকার। বিদায় নেবার ঠিক আগ মুহূর্তে উনি আমার হাতে পাঁচ হাজার টাকার একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নাও। শুরু করে দাও। এবার হবে, তোমাকে দিয়ে হবে।

এবার আমাকে দিয়ে হবে কি হবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবু আমি হাত বাড়িয়ে খামটা নিলাম। কারণ, আমার মেসের ভাড়া বাকি পড়েছে তিন মাসের। এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পুরো বকেয়া শোধ না হলেও, 'ভাড়াখেলাপি'র তালিকা থেকে নামটা হালনাগাদ করা যাবে কিছুদিনের জন্য আপাতত।

সকালে মেসে শুয়ে শুয়ে সাফায়েত ভাইয়ের উপন্যাসের প্লট নিয়েই ভাবছি। প্লট মাথায় আসছে না।

এমন সময় ছোটো খালার ফোন।

ফোন করে উনি বললেন– শোন, সালাহউদ্দিনের শ্বশুর মারা গেছে। প্লিজ একটু আয় না বাবা।

সালাহউদ্দিন হলেন ছোটো খালুর ভাতিজা। আমার খালুর ভাতিজা মানে আমার অত্যন্ত দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তার শ্বশুর মারা যাওয়াতে আমাকে কেন ছোটো খালার বাসায় যেতে হবে বুঝতে পারলাম না।

ছোটোখালার এরকম উদ্ভট অনুরোধে আমার বিরক্ত হওয়া উচিৎ। কিন্তু উনি ফোন করলে আমি বিরক্ত হতে পারি না। কারণ, উনি যতবারই ফোন করে আমাকে ডাকেন, ততবারই আমার পকেটে কিছু অর্থযোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আমি বললাম, কোথায় যেতে বলছো? তোমার বাসায়? নাকি সালাহ উদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুরের বাসায়?

খালা বললেন, আগে আমার বাসায়। সেখান থেকে তোর ছোটো খালুকে নিয়ে ওই বাসায় যেতে হবে। তোর খালুর শরীরের যে অবস্থা, আমি তাকে একা ছাড়তে চাচ্ছি না।

ছোটোখালুর শরীরের ব্যাপারটা যে পুরোটাই খালার আদিখ্যেতা এটা আমি বেশ ভালো করেই জানি। খালুর শরীরের অবস্থা মোটেও খুব একটা খারাপ না। খালু একটি ব্যাংকের বড়োসড়ো কর্মকর্তা ছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। সকালে নিয়মিত হাটেন, জিম করেন। আজ সকালেও উনি জিম করা অবস্থার একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।

আমি খালাকে বললাম, তো তুমি যাচ্ছ না কেন সঙ্গে?

খালা বেশ মুখ ফুলিয়ে বলল, নাহ আমি যাবো না।

কেন?

উনি বললেন, কেন যাবো? তোর নানা যেদিন মারা গেলো, ওদের বাসা থেকে কেউ এসেছিলো? দেখেছিস কাউকে? আসেনি। তারা বড়োলোক বলে আমাদেরকে কোনোদিনই পাত্তা দেয় না।

আমি বললাম, বড়োলোক তো তুমিও খালা।

আরে আমরা বড়োলোক হতে পারি। কিন্তু ওরা অতি-বড়োলোক। তাই আমাদের মতো কম বড়োলোকদের পাত্তা দেয় না। সালাহউদ্দিন তোর খালুর ভাতিজা হয়– তোর খালু যাক। আমি যাবো না– কথা ফাইনাল।

আমি একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম, ঠিক আছে খালা। আমি আসছি।

আমার অনিচ্ছার কারণ, ভেবেছিলাম আজ উপন্যাসটা শুরু করবো। সেটা আর হলো না। আর তা ছাড়া শুরু করতে চাইলেই তো শুরু করা যায় না। প্লট লাগে। আমার মাথায় যেহেতু কোনো প্লট আসছে না, ভাবলাম, খালুকে বরং সার্ভিসটা দিয়েই দেই। এতে যদি পকেটে কিছু টাকা পয়সা ঢোকে তো মন্দ না।

ছোটোখালার বাসায় পৌঁছে দেখি বাসায় খালা এবং খালুর ভেতর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বিশ্বযুদ্ধের কারণ : ছোটোখালার ওই বাসায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

ছোটো খালু চাচ্ছেন খালা তাঁর সাথে যাক। খালা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

স্ত্রীর সাথে যুদ্ধে জিততে না পেরে, ছোটো খালু ঘোষণা দিলেন, তুমি না গেলে আমিও যাবো না।

তাই শেষ পর্যন্ত খালা আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। আমার বেশ রাগ হলেও এলাম। কারণ এখানে হাজিরা বাবদ ছোটো খালার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেলো।

খালা অবশ্য টাকাটা দেবার সময় সরাসরি 'হাজিরা বাবদ' বলেননি। হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, কী সব সস্তা কাপড়চোপর পরে ঘুরিস। বড়োলোকের বাড়ি যাচ্ছিস। আর্টিজান থেকে একটা শার্ট কিনে পরে যাবি। আর শোন, শার্টটা ব্ল্যাক কালারের কিনিস। বড়োলোকদের মরা বাড়িতে কালো পোশাক পরে যেতে হয়। আর খবরদার বাসে যাবি না, উবারে যাবি। ওই বাড়িতে আমার প্রেস্টিজটা পাংচার করিস না।

আমি খালার প্রেস্টিজ পাংচার করি নাই– এসেছি উবারেই। তবে সেটা ধানমন্ডি থেকে নয়। বাসে করে গুলশান-২ গোল চক্করে নেমে, সেখান থেকে মিনিমাম ভাড়ায় উবারে এসেছি।

আর, অবশ্যই কোনো শার্ট কিনি নাই। শার্ট কেনার প্রশ্নই আসে না।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িটা বেশ খানদানি ডুপ্লেক্স বাংলো টাইপ বাড়ি। ডেভেলপারদের চক্করে পড়ে ঢাকা শহর থেকে এরকম ডুপ্লেক্স বাংলো টাইপ বাড়ি মোটামুটি উঠেই গেছে। যে অল্প কয়টা এরকম বাড়ি এখনো টিকে আছে, তাঁদের মধ্যে একটা হলো এই বাড়িটা। খুব সম্ভবত ডেভেলপারদের লোভনীয় টাকার অফার এই খানদানি পরিবারকে টলাতে পারেনি।

এখানে পৌঁছে জানতে পারলাম সালাহউদ্দিন ভাই নিজেই এখনো এসে পৌঁছান নাই। অথচ আমি, যে কিনা তার অতি দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তার আগে চলে এসে বসে আছি।

খুবুই বিব্রতকর একটা সিচুয়েশন।

আমি বিব্রত হয়ে ড্রইং রুমে বসে আছি। কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। আমিও কাউকে চিনতে পারছি না।

তার উপর একটু পরপর একজন করে মুরুব্বি এসে বেশ সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করছে, কিছু মনে করো না বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারছি না?

তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে– আমি কোনো বিয়েবাড়িতে 'হাকুল্লা' খেতে এসেছি।

দাওয়াত ছাড়া বিয়েবাড়িতে যারা খেতে যায় তাদেরকে 'হাকুল্লা' বলে। এই নামে আমার একটা উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসে বিয়ে বাড়িতে বিনা দাওয়াতে পোলাও-বিরিয়ানি খাওয়ার প্রচুর অব্যর্থ টেকনিক বলা আছে। সবই আমার ব্যক্তিগত রিসার্চ করা টেকনিক।

এদের কর্মকাণ্ড দেখে এই মুহূর্তে ভাবছি– 'মরাবাড়ি'তেও হাকুল্লা খাওয়া নিয়ে একটা রিসার্চ করে ফেলবো নাকি? হয়তো ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগতে পারে।

এদেশে এমনিতেই রিসার্চ খুব একটা হয় না। আমার এক মামা আছেন রিসার্চ পাগল মানুষ। তিনি সারোয়ার মামা। সিঙ্গাপুরের নামি এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেশে চলে এসেছেন। দেশে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রিসার্চ করার জন্য। রিসার্চকে উনি প্রাইভেট সেক্টরে নিতে চান। একটা ফাউন্ডেশনও বানিয়েছেন– সেখান থেকে তিনি ও তাঁর দল তরুণ প্রজন্মকে রিসার্চের কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।

ভাবছি সারোয়ার মামাকে একটা কল করে এই সুসংবাদটা দেই। রিসার্চ শুরু করার আগে মামার দোয়া নিয়ে শুরু করলে ভালো হতো।

কিন্তু মামাকে কল করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আমাকে বিব্রত মুখে সব মুরুব্বিকে এক্সপ্লেইন করতে হচ্ছে যে আমি সালাউদ্দিন ভাইয়ের ছোটো চাচার ভাগ্নে ইন ল।

আমার কথা শুনে কেউ জিজ্ঞেস করে, কোন ছোটো খালু?

কেউ জিজ্ঞেস করে, কোন ভাগ্নে?

আমি ব্যাখ্যা করি।

একজন তো চোখ বাঁকা করে জিজ্ঞেস করে বসলো– সালাহউদ্দিনের ছোটো চাচা কোথায়? উনি এসেছেন?

আমি বললাম, না।

উনার সন্দেহ মনে হয় আরও বেড়ে গেলো। চাচা আসে নাই, আর আমি তার ভাতিজা এসে হাজির– ব্যাপারটা সন্দেহ হবার মতোই। ডালপুরি ম্যা কুচ কালা হ্যাঁ– এরকম একটা ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরেকজন তো সালাহউদ্দিন ভাইকেই চিনতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করে বসলেন, কোন সালাহউদ্দিন?

এই মুরুব্বি দেখি নিজেদের বাড়ির জামাইকেই চিনে না? নাকি উনি নিজেও আমার মতো এই বাড়ির দূর সম্পর্কের কেউ?

আমি তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দিলাম। আমার হাসি দেখে মুরুব্বি মনে হয় আরও বিভ্রান্ত হলেন– কারণ তার ভুরু আরও বেশি কুঁচকে গেলো। উনি ভেতরে চলে গেলেন।

আমি আশেপাশের লোকজনের কথাবার্তায় মনোযোগ দিলাম। ড্রইং রুমে বসা লোকজনের কথাবার্তা শুনে একটা বিষয়ে বেশ পরিষ্কার হলো– সালাহউদ্দিন ভাই বেশ ভালোই দাও মেরেছেন। উনার শ্বশুর বাড়ি আমার ধারণার চেয়েও বেশি খানদানি।

তারা যে বেশি খানদানি সেটা তাদের কথাবার্তা শুনেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এইমাত্র আমার উলটো পাশের সোফায় এক মুরুব্বি এক ইয়াং ফ্রেঞ্চকাটওয়ালা ছেলেকে বললেন– তুমি কাওসারের ছেলে না? তোমার আব্বু আসে নাই?

ফ্রেঞ্চকাট উত্তর দিলো– জি না আঙ্কেল। আব্বু তো পেনসেলভিনিয়ায় আছেন।

মুরুব্বি বললেন, ওহ। ওর সাথে অনেকদিন দেখা নেই আমার। লাস্ট দেখা হয়েছিল আলাবামা এয়ারপোর্টে– হঠাৎ করেই...

বেশি খানদানি বড়োলোক না হলে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কেউ আমেরিকার স্টেটগুলার নাম বলে না। খানদানি বড়োলোকদের কাছে

আলাবামা, পেনসেলভিনিয়া আর কুমিল্লা, নোয়াখালী কিংবা ময়মনসিংহ একই কথা। এই ফ্রেঞ্চকাট যদি খানদানি বড়োলোক না হতো, তা হলে তার উত্তর হতো— আব্বু তো আমেরিকায়।

দরজার আড়ালে সেই মুরব্বিকে, যিনি সালাহউদ্দিন ভাইকে চিনতে পারেন নাই, দেখা যাচ্ছে আবার। তিনি একজন মহিলাকে ডেকে এনে আমাকে দেখিয়ে কী যেন বলছেন। খুব সম্ভবত বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে– এই সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে সাবধান থাকার জন্য।

আমি তাদের সন্দেহ আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। বাড়িটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। একটা খানদানি ডেড মেন'স হাউজ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে রাখার সুযোগ ঘনঘন পাওয়া যায় না।

এক কোনায় দেখি দুজন মোবাইল ফোন দিয়ে একের পর এক কল করে চলেছেন। তাদের হাতে একটা লম্বা তালিকা। সেই তালিকা দেখে দেখে কল করে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হচ্ছে।

বুঝলাম বিয়ে শাদিতে দাওয়াত করার জন্য যেমন লিস্ট করা হয়, তেমনি বড়োলোকদের বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ দেবার জন্যও একটা লিস্ট করা হয়।

এক জায়গায় দেখি দুইজন মোটাসোটা 'মাজেদা খালা' টাইপ মহিলা ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছেন। আমি দেরি না করে ওই দুজনের পাশে গিয়ে কান পাতলাম। মরাবাড়িতে ফিসফিস করে কথা বলা ক্যারেক্টার মানেই স্টোরির গন্ধ।

আমাকে হতাশ হতে হলো না। স্টোরি পাওয়া গেলো। বেশ প্যাঁচ লাগা স্টোরি।

প্যাঁচটা লেগেছে, লাশ কোথায় দাফন হবে এটা নিয়ে। খুব সম্ভবত মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনেরা চাচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে নিয়ে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করতে। এটাই তাদের পরিবারিক ঐতিহ্য।

অন্যদিকে মুর্দার স্ত্রী অর্থাৎ সালাউদ্দিন ভাইয়ের শাশুড়ি, চাচ্ছেন– লাশ দাফন হবে বনানী কবরস্থানে। উনি নাকি মারা যাবার আগে শেষ ইচ্ছে হিসেবে এটাই বলে গেছেন।

আগেও খেয়াল করে দেখেছি যেকোনো খানদানি বাড়িতে কেউ মারা গেলে প্রথম ঝামেলাটা শুরু হয় মরহুমের 'শেষ ইচ্ছে'টা নিয়ে।

বড়োলোকেরা সম্ভবত তাদের 'শেষ ইচ্ছে' দিয়ে মরার আগে একটা হালকা 'প্যাঁচ' লাগিয়ে দিয়ে যেতে আরাম পান।

আমার মনে হলো এই প্যাঁচটা তাঁরা ইচ্ছে করে লাগান। যেন মৃত্যুর পরেও তাদের গুরুত্বটা শেষবারের মতো বোঝা যায়।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুরের শেষ ইচ্ছে নিয়েও ভালোই প্যাঁচ লেগেছে মনে হলো। এই প্যাচের কারণে মুর্দার সন্তানেরা উদভ্রান্ত অবস্থায় আছেন– তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না– মায়ের পক্ষে যাবেন– নাকি চাচাদের সাথে যাবেন। সবাই অপেক্ষা করছেন পরিবারের বড়ো জামাই সালাহউদ্দিনের জন্য।

আমি বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক যদি মরার আগে তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা স্ত্রীকে বলে গিয়েই থাকেন, তা হলে কনফিউশনটা কোথায়? এটা তো একদম ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। এ যুদ্ধে আমি সালাউদ্দিন ভাইয়ের শাশুড়ির নিশ্চিত বিজয় দেখতে পাচ্ছি।

তবে এই মুহূর্তে আমি মৃতের কবর কোথায় হবে– এটা নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি এবং সেই সঙ্গে কিছুটা ঈর্ষান্বিতও হচ্ছি, সালাহউদ্দিন ভাইয়ের ভাগ্য নিয়ে।

তিনি শুধু ভালো দাওই মারেননি– শ্বশুরবাড়িতে নিজেকে অন্য একটা উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিতও করে ফেলেছেন। তাকে ছাড়া কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

অথচ এই সালাহউদ্দিন ভাই কিছুদিন আগেও ছিলেন কপর্দকহীন। নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলেন।

নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাটা অত্যন্ত মহৎ একটা ব্যাপার। এজন্য উনার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিৎ ছিলো। কিন্তু তার সেসব চেষ্টার মাঝে একধরনের ধান্দাবাজি থাকতো বলে আমি তাকে কোনোদিনই শ্রদ্ধা করতে পারি নাই।

এই তো কয়েকবছর আগেই তিনি খুব ধুমধাড়াক্কা করে তার কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছিলেন। আমাকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল।

আমি খুব আগ্রহ নিয়ে গেলাম উনার কোচিং সেন্টার দেখতে। উনার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ না থাকার পরেও তার কোচিংয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমার যাবার কারণ ক্যারেক্টার হিসেবে উনি বেশ মজার। আমার লেখালিখির কাজে এ ধরনের ক্যারেক্টার খুব ইন্টারেস্টিং অ্যালিমেন্ট হয়।

গিয়ে দেখি কোচিং সেন্টারের সামনে বড়ো করে সাইনবোর্ড ঝুলানো–
"সালাহউদ্দিন'স টিউটোরিয়াল (আবাসিক/অনাবাসিক)"

কোচিং সেন্টারও যে আবাসিক হয় জেনে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম।

সালাহউদ্দিন ভাইকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই উনি বললেন– আরে, বুঝলা না? আজকাল বিজনেসে অনেক কম্পিটিশন। ক্লায়েন্টকে সবসময় নতুন কিছু অফার দিতেই হয়।

আমি বললাম, কথা সত্য। বিজনেসের ক্ষেত্রে ইনোভেশনটাই মূল কথা।

উনি বললেন, চলো তোমাকে হোস্টেলটা দেখাই।

আমি হোস্টেল দেখতে উনার সাথে কোচিং সেন্টারের পাশেই একটা বিল্ডিংয়ের দিকে হাঁটা দিলাম।

হোস্টেল দেখে তেমন কোনো ইনোভেশন অবশ্য চোখে পড়ল না।

একটা সাদাসিধে তিন তলা বিল্ডিংয়ের সামনে বেশ বড়ো করে আরেকটা সাইনবোর্ড ঝোলানো– সেখানে লেখা "ছাত্রাবাস নং-৩"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– বাহ্ বাহ্। শুরু না করতেই এত ছাত্র পেয়ে গেছেন! অলরেডি তিনটা হোস্টেল হয়ে গেছে?

উনি মুচকি হেসে বললেন– আরে নাহ। হোস্টেল একটাই। আমি প্রথমটার নম্বরই দিয়েছি ৩ নম্বর হোস্টেল।

আমি বললাম, বাহ্। ১ আর ২ বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট ৩ নম্বর! এর কারণ কী?

বুঝলা না? ৩ নম্বর হোস্টেল দেখে তোমার মতো সবাই মনে করবে এখানে অনেক ছাত্র পড়ছে। ছাত্রের বাবা মা মনে করবে এই কোচিং সেন্টারের উপর ভরসা করা যায়। হাহা। সবই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বিজনেস করতে গেলে এরকম শান শওকত ওয়ালা স্ট্র্যাটেজির দরকার আছে। তাই 'অল দ্যা বেস্ট' বলে চলে এসেছিলাম।

এক বছর পর একটা ইনভাইটেশন কার্ড পেলাম। তাতে লেখা "সালাহউদ্দিন'স টিউটোরিয়ালের অর্ধযুগ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনি সাদর আমন্ত্রিত।"

এক বছর আগে উদ্বোধন হওয়া কোচিং সেন্টারের অর্ধযুগ পূর্তির অনুষ্ঠান! বুঝলাম সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এখনো চলছে।

সালাহউদ্দিন'স টিউটোরিয়াল নিয়ে মুগ্ধ করার মতো তার নানা ইনোভেটিভ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি থাকা সত্ত্বেও, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কোচিং সেন্টারটি টিকে থাকতে পারলো না। দুবছরের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে গেলো।

তবে কোচিং সেন্টার বন্ধ হবার আগে সালাহউদ্দিন ভাই তার জীবনের সেরা দাওটা মেরে দিলেন ঠিকই। সেই কোচিং সেন্টারের ছাত্রী অত্যন্ত বড়োলোকের মেয়ে শিমু ভাবিকে পটিয়ে বিয়ে করে ফেললেন।

সেই শিমু ভাবির বাবাই মারা গেছেন আজ এবং এ বাড়ির সবাই এই মুহূর্তে অধীর আগ্রহে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন– তিনি এলে একটা সিদ্ধান্ত হবে, লাশ ঢাকায় কবর হবে নাকি গ্রামের বাড়িতে। এ ঘটনা থেকে এই পরিবারে সালাহউদ্দিন ভাই যে অল্প ক'দিনেই নিজের একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে ফেলেছেন সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

আমি মাজেদা খালা টাইপ দুজনের ফিসফিস আলাপ ছেড়ে নিচে চলে এলাম।

নিচে নেমে সিগারেট খাচ্ছি। এমন সময় বাসার সামনে বিরাট বড়ো একটা নিশান পেট্রোল গাড়ি এসে থামলো। সেই গাড়ি থেকে সালাউদ্দিন ভাই এসে নামলেন।

আমি ভাবলাম উনি হয়তো আমাকে খেয়ালই করবেন না, হুলুস্থুল করে ভেতরে ঢুকে যাবেন।

কিন্তু না। তার মধ্যে কোনো হুলস্থুলের লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি তার সঙ্গের লোকদের ভেতরে যেতে বলে, ধীরে সুস্থে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

আমাকে আড়ালে নিয়ে বললেন, তমাল এসেছো? খুব ভালো হয়েছে। দাও একটা সিগারেটে দাও।

আমি বললাম, ভাই আপনি এখন সিগারেট খাবেন? সবাই উপরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

তিনি বললেন, করুক। অপেক্ষা না করলে জামাইদের দাম বাড়ে না।

আমি ভাবলাম উপরে যে প্যাঁচটা লেগে আছে, সে ব্যাপারে উনাকে আগে থেকেই একটা ব্রিফ দিয়ে রাখি।

বললাম, ভাই, উপরে কিন্তু আপনার জন্য একটা কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে। আমি কি এখনই আপনাকে সিচুয়েশনটার একটা ব্রিফ দিয়ে রাখবো?

সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, ব্রিফ লাগবে না। আমি জানি সব।

আমি বললাম, তো, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? আপনার শ্বশুরের শেষ ইচ্ছা মতোই বনানীতেই তো দাফন হবে নাকি?

সালাউদ্দিন ভাই বললেন, কীসের শেষ ইচ্ছা? হাসপাতালে উনার শেষ সময় পুরাটা সময় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। উনি এরকম কিছুই বলেন নাই। সব আমার শাশুড়ির বানানো কথা? ফাজিল মহিলা একটা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তা হলে উনি মিথ্যা কথা কেন বলছেন?

বুঝবা না। ফ্যামিলি পলিটিক্স।

আমি আসলেই বুঝলাম না। তবে এটা বুঝলাম, সালাউদ্দিন ভাই উনার শাশুড়িকে মোটেও পছন্দ করেন না।

এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম, কেইসটাকে যত ওপেন অ্যান্ড শাট ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা তেমন না। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শাশুড়ির জারিজুরি শেষ হবার পথে। শেষ পর্যন্ত মুর্দার দাফন কি তা হলে গ্রামের বাড়িতেই হবে?

ভেবেছিলাম, সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথে দেখা করে আমার কর্তব্য শেষ করে চলে যাবো। কিন্তু কাহিনির এই ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে চলে যাওয়া যায় না। আমার যাওয়া হলো না। ভাবলাম শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা কী হয় দেখেই যাই।

সালাউদ্দিন ভাইয়ের সাথে উপরে উঠামাত্র সবাই তাকে ঘিরে ধরলো।

আলাবামা এয়ারপোর্টে কাওসার সাহেবের সাথে দেখা হওয়া সেই মুরুব্বি এসে বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ তুমি? আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, হাসপাতালের বিল টিল ক্লিয়ার করে কমিশনারের অফিস থেকে একবারে ডেথ সার্টিফিকেটটা ইস্যু করে নিয়ে এলাম মামা। দাফনের আগে এই সার্টিফিকেট লাগবে তো।

মুরুব্বি বললেন, ভালো করেছো। কিন্তু এখন তুমি সিদ্ধান্ত দাও, দাফন কোথায় হবে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে সালাউদ্দিন ভাই বেশ সিরিয়াস মুডে বললেন, দেখেন আপনারা মুরুব্বিরা থাকতে আমার্ কিছু বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। তবে বেয়াদবি না নিলে আমি একটা কথা বলি।

আমার শ্বশুর সাহেব যখন আম্মাকে তার শেষ ইচ্ছার কথা বলেই গেছেন, আমার মনে হয় উনার ইচ্ছাটাকেই আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মরাবাড়ির সবাই জামাই বাবাজির এই বিচক্ষণতায় বেশ মুগ্ধ হলেন। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সম্মতি না পেয়ে 'লাশ গ্রামের বাড়িতে দাফন করার পক্ষ'ও যেন কিছুটা মিইয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর সালাউদ্দিন ভাইকে একটু আড়ালে পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই এটা কী হলো?

সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, কোনটা কী হলো?

আমি বললাম, আপনিই একটু আগে বললেন, আপনার শাশুড়ি মিথ্যা কথা বলেছেন। তারপরও আপনি জেনেশুনে এই মিথ্যেটাকে অ্যান্ডোর্স করে দিলেন?

সালাহউদ্দিন ভাই মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললেন, তোমাকে বলেছি না, বুঝবা না। ফ্যামিলি পলিটিক্স।

আমি এমন একটা সম্ভ্রান্ত বংশের এই কুৎসিত ফ্যামিলি পলিটিক্সের পরিচয় পেয়ে বেশ মর্মাহত হলাম। আর ঠিক করলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মতো, এই ফ্যামিলির পলিটিক্সের গতি প্রবাহের ওপর আমাকেও একটা সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে।

কারণ এতে প্রচুর স্টোরি আছে। এখান থেকে আমি নতুন উপন্যাসের জন্য কোন প্লট পেলেও পেতে পারি।

এই মুহূর্তে একটা ভালো প্লটের আমার খুবই দরকার। সাফায়েত ভাইয়ের কথা মতো লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এটাই আমার শেষ সুযোগ।

ভাবছি মরাবাড়ির খানদানি পলিটিক্স নিয়েই আমার পরবর্তী উপন্যাসটা শুরু করে দিবো।

***

শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুরের দাফন গ্রামের বাড়িতেই হচ্ছে।

এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে। আর এ নাটকের মধ্যমণি যথারীতি সালাহউদ্দিন ভাই।

তার মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রথমে সবাই বনানী গোরস্থানে দাফন মেনে নিয়েছিলেন।

আমি যখন সালাহউদ্দিন ভাইকে আড়ালে পেয়ে বললাম, আপনি জেনেশুনে এই মিথ্যেটাকে অ্যান্ডোর্স করে দিলেন?

সালাহউদ্দিন ভাই মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, বুঝবা না। ফ্যামিলি পলিটিক্স।

তার মুচকি হাসির মর্মার্থ আমি তখন বুঝতে পারিনি। বরং তার কথা শুনে আমি মর্মাহত হয়ে বসে রইলাম। মর্মাহত হবার কারণ সালাহউদ্দিন ভাই এখনো শুধরান নাই একটুও। তার কাজকর্মের মাঝে এখনো একজন ধান্দাবাজের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

আমি খুবই আশ্চর্য হলাম এত স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি এই পরিবারে নিজের এত সুসংহত অবস্থান কীভাবে তৈরি করে নিলেন? অতি-বড়োলোকেরা মনে হয় ধান্দাবাজ লোকদের চিনতে পারে না।

আর তা ছাড়া সালাহউদ্দিন ভাই তার চালগুলো খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে চেলে থাকেন। শেষমুহূর্তে এমনই এক চাল চেলে তিনি পুরো গল্পের প্লটটাকেই পালটে দিলেন।

লাশ বনানী গোরস্থানে দাফনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই প্রথম জানাজা– গুলশান আজাদ মসজিদে।

এমন সময় সালাহউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন– চলো তো আমার সাথে।

আমি বললাম, কোথায়?

উনি বললেন, ফ্যামিলি পলিটিক্স– সিজন টু দেখতে।

তখনই বুঝতে পারলাম ঘটনা আরও বাকি আছে।

মধ্যবিত্তের মরাবাড়িগুলো সাধারণত খুব বোরিং হয়। কিন্তু খানদানি বড়োলোকদের মরাবাড়ি বেশ 'হ্যাপেনিং' দেখা যাচ্ছে।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের ফ্যামিলি পলিটিক্স– সিজন টু দেখার আমন্ত্রণে আমি বেশ উত্তেজনা ফিল করলাম। আর সেই উত্তেজনার আনন্দে আমার মনে হলো সকালে ছোটো খালার উপর বিরক্ত হওয়াটা উচিৎ হয় নাই। আমি ছোটো খালার সকালের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।

আমার বাবা মারা গেছেন সেই ছোটো বেলায়। ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় মারা গেলেন মা। তারপর থেকে এই ছোটো খালাই যা একটু খোঁজ খবর রাখেন আমার। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে নানা অপ্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে আমার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দেন। উনার ধারণা আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। আমি আসলে ঠিকই বুঝতে পারি। বরং আমি যে বুঝতে পেরেছি সেটা তাঁকে বুঝতে দেই না।

ফ্যামিলি পলিটিক্স– সিজন টু ব্যাপারটা আসলে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের নিজেরই আরেকটা পলিটিক্যাল চাল।

লাশ দাফনের স্থান নিয়ে মৃদু উত্তেজনা শেষ হয়ে যখন আত্মীয়-স্বজনরা সবাই আবার শোক প্রকাশে ব্যস্ত, সেই সময় সালাহউদ্দিন ভাই আমাকে ফ্যামিলি পলিটিক্স সিজন টু দেখার আমন্ত্রণ জানালেন।

তিনি তার স্ত্রী শিমুকে ইশারায় ডেকে বললেন, শোন একটু।

এই মুহূর্তে পিতার শোকে শিমু ভাবি বেশ কাতর অবস্থায় আছেন। আরও কয়েকজন মহিলার সাথে তিনি গোল হয়ে বসে তজবি জপছেন। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের ইশারার ডাকে ভাবি মনে হয় একটু বিরক্ত হলেন।

উনি এসে ফিসফিস করে বললেন, কী হয়েছে বলো।

শিমু ভাবির ফিসফিস করে কথা বলাতে আমি খুব বেশি আশ্চর্য হলাম না। এতক্ষণে আমি বুঝে গেছি, পলিটিক্সওয়ালা খানদানি বাড়ির লোকজনেরা বেশিরভাগ কথাই ফিসফিস করে বলে।

সালাহউদ্দিন ভাই গম্ভীর মুখে বললেন, একটা সমস্যা।

কী সমস্যা?

বাবাকে নিয়ে কবরস্থানে যাবার পরে তোমার চাচারা নিশ্চয়ই বলবে তোমাদের পরিবারের অন্যদের কবর যেখানে সেখানেই বাবাকে কবর দিতে।

শিমু ভাবি বললেন, হ্যাঁ, বলবে। তাতে সমস্যা কী হয়েছে?

সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, আমার কী সমস্যা হবে। আমি জামাই মানুষ। কিন্তু ওখানে যে তোমাদের আমেনা ফুপুর কবরও আছে, ভুলে গেছো?

এবার ভাবির কপালে একটা ভাঁজ দেখা গেলো। তিনি সালাহউদ্দিন ভাইকে বললেন, তাই তো। একটু মাকে বলো না বিষয়টা?

আমি কীভাবে বলি? আমি জামাই মানুষ! তুমি বলো। আর আমি যে একথা তোমাকে বলেছি সেটা বলারও দরকার নাই, বিষয়টা উনার জন্য লজ্জার হয়ে যাবে তা হলে।

'হুম' বলে চিন্তিত মুখে শিমু ভাবি চলে গেলেন অন্দরমহলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখান থেকে বের হয়ে এলেন সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শাশুড়ি স্বয়ং।

তাকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি নতুন কোনো ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। উপস্থিত সবার মনোযোগ এখন তার দিকে।

ভদ্রমহিলা সালাহউদ্দিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন বাবা। অনেক ভেবে দেখলাম, সব মুরুব্বিরা যেহেতু চাচ্ছেন, দাফন তা হলে গ্রামেই হোক। তুমি সব ব্যবস্থা করো বাবা।

সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, কিন্তু মা, বাবার শেষ ইচ্ছা...

ভদ্রমহিলা সালাহউদ্দিন ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে মারা যাবার আগে লোকজনের মাথা কি ঠিক থাকে নাকি। সেই সময় কে কী বলেছে– সেটা ধরে বসে থাকলে তো হবে না।

জি আম্মা। আমি সব ব্যবস্থা করছি। বলেই সালাহউদ্দিন ভাই আমাকে ইশারা করে বললেন, চলো চলো অনেক কাজ করতে হবে এখন।

আমি আশ্চর্য হয়ে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের পিছু নিলাম। নিচে নেমে এসে বললাম, ঘটনা কী হলো ভাই? কে এই আমেনা ফুপু?

সালাহউদ্দিন ভাই হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন এবং কথিত প্রেমিকা। শ্বশুর মশাইয়ের যৌবনকালে উনাকে জড়িয়ে কিছু স্ক্যান্ডালের কথা বার্তা শোনা যায়। এমনকি আব্বাজানের বিরহে এই ভদ্রমহিলা নাকি সারাজীবেন বিবাহও করেন নাই। সত্য মিথ্যা অত জানি না।

আমি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের দিকে আরেকবার তাকালাম। আমি নিশ্চিত উনি যত নিরুৎসাহীভাবে 'সত্য মিথ্যা জানি না' বললেন ব্যাপারটা আসলে তা না। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। এরকম একটা রসালো ঘটনার পুরোটা না জেনে থাকার মানুষ উনি না।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মতো 'কুটনা' লোকদের কাছে এসব তথ্য হলো মোক্ষম অস্ত্র। তারা এসব অস্ত্র হিসেবে সংগ্রহ করে অস্ত্রাগারে রেখে দেন। যখন প্রয়োজন হয় তখন সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এখন যেমন করলেন।

আমি ভাবছি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শাশুড়ির কথা। একজন মানুষ কতটুকু হিংসা পরায়ণ হলে স্বামীর মৃত প্রেমিকাও তার হিংসা থেকে রক্ষা পান না।

তবে একটা বিষয় পরিষ্কার নয়। সালাহউদ্দিন ভাই কেন লাশটা শেষপর্যন্ত গ্রামের বাড়িতেই নিয়ে যাবার পক্ষে চাল দিলেন? ঢাকায় দাফন হলে তো উনার ঝামেলা কমে যেতো। আর তা ছাড়া শ্বশুর মারা যাবার পর শাশুড়ির পক্ষে কাজ করাটাই তো উনার জন্য স্বাভাবিক হতো।

আমাকে চিন্তা করতে দেখে সালাহউদ্দিন ভাই বললেন, কী হলো তমাল, দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো?

আমি বললাম, কোথায়?

আরে, লাশটা মুক্তাগাছার বাঁশগাড়ি গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো, চলো চলো।

সালাহউদ্দিন ভাই এমনভাবে 'চলো চলো' বললেন যেন উনার শ্বশুর আমার খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁর লাশ মুক্তাগাছা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করাটা আমার জন্য খুবই স্বাভাবিক একটা দায়িত্ব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তাগাছায় যাওয়ার জন্য একটা লাশবাহী গাড়ি ভাড়া করে আনা হলো। গাড়ির গায়ে বড়ো করে লেখা, আকবর মেডিক্যাল সার্ভিস– লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ গাড়িতে তোলা হবে। আমি সেই লাশটার দিকে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে মনে মনে ভাবছি, মৃত্যুর পরে মানবদেহ আর যেকোনো পশুপাখির দেহের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? সকল মৃতদেহই একইভাবে ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যে পরিণত হয়। এসব ফ্রিজিং

গাড়ি-টাড়ি দিয়ে পচনটাকে যা একটু দেরি করানো যায় আর কী। পচে যাওয়াটাই দেহের একমাত্র পরিণতি।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের শ্বশুর মারা গেছেন চার পাঁচ ঘণ্টা হলো। তাঁর দেহের পচনও শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

এই পচন মানে কিন্তু নতুন অনেক জীবনের সূচনা। অনেক নতুন অণুজীবের জন্ম নেয়া।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো মানুষ মারা যাবার পর তার দেহের প্রথম পচনটা শুরু হয় তার নিজের দেহ থেকেই। একে বলা হয় 'আত্ম-পরিপাক।

মৃত্যুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অক্সিজেনের অভাবে বডি সেলগুলোতে এসিডিটি বেড়ে যায়। শুরু হয় নানান রাসায়নিক বিক্রিয়া। এর ফলে দেহের এনজাইমগুলো ভাঙতে শুরু করে দেয় নিজ দেহের কোষগুলোকেই।

দ্বিতীয় ধাপে শুরু হয় 'রিগর মর্টিস'। পেশীতে শক্তি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে চোখের পাতা, চোয়াল, ঘাড়ের পেশী, হাত, পা সব শক্ত হয়ে যায়।

এরপর শুরু হয় ব্যাকটেরিয়ার খেলা। মৃত্যুর সাথে সাথে মরদেহের সকল ডিফেন্স সিসটেম ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই সুযোগে ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাহসও ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। ক্ষুদ্রান্ত্র আর বৃহদান্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো সারা শরীরে ছড়িয়ে পরতে শুরু করে। এতদিন ধরে নিজের পোষা ব্যাকটেরিয়াগুলোই আক্রমন করে পচাতে শুরু করে দেহকে।

জীবিত অবস্থায় মানুষ যেমন সবসময়ই আপন লোকেদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়, মৃত্যুর পরে তার প্রথম ক্ষতির শুরুটাও তেমনি নিজের পোষা ব্যাকটেরিয়া দ্বারাই ঘটে থাকে।

আকবর মেডিক্যাল সার্ভিসের– লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি মুক্তাগাছার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, সেই গাড়ির ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আছি আমি।

মুক্তাগাছায় দাফনের সিদ্ধান্ত হবার পর ঢাকার আত্মীয় স্বজনদের জন্য গুলশান আজাদ মসজিদে প্রথম জানাজার আয়োজন করা হয়েছিলো।

সেই জানাজা পাঠ শেষ করেই বিদায় নিবো ভাবছি, এমন সময় সালাহ উদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আসো তো লাশটা গাড়িতে তুলতে হবে। সাহায্য করো।

আমি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলাম।

লাশ গাড়িতে তোলার পরে সালাহউদ্দিন ভাই গাড়ির দরজা খুলে আমাকে বললেন, উঠে বসো। আমরা পেছনের গাড়িতেই তোমাদেরকে ফলো করছি।

আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। সালাহউদ্দিন ভাইয়ের সাথে আমার আত্মীয়তার যে দূরত্ব আছে, তাতে তিনি নিজে মারা গেলেও লাশের সাথে আমার মুক্তাগাছা যাওয়াটা মানায় না। আর সেখানে তার শ্বশুরের লাশ নিয়ে আমাকে উনি মুক্তাগাছা পর্যন্ত যেতে বলছেন। কেন?

আমি সালাহউদ্দিন ভাইয়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, আমি! আমি কেন এর...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বললেন, আরে মুক্তাগাছা তো কাছেই। যেতে আসতে পাঁচ ছয় ঘণ্টার বেশি লাগবে না। চলো চলো।

এরপর মানিব্যাগ থেকে তিন হাজার টাকা বের করে সালাহউদ্দিন ভাই, আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এই নাও, রাস্তার হাতখরচ। চা নাস্তা খেয়ে নিও কোথাও। ওকে?

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উনি এবার ড্রাইভারের দিকে ফিরে বললেন, ড্রাইভার সাহেব, আপনি কিন্তু গাড়ির ইমারজেন্সি লাইটটা জ্বালিয়ে রাখবেন সবসময়। পেছনের সব গাড়ি সেটা ফলো করবে। সবাই একসাথে যাবো। কেউ আলাদা হবে না। বুঝতে পেরেছেন?

ড্রাইভার প্রবলভাবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

সালাহউদ্দিন ভাইয়ের দেওয়া তিন হাজার টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কী করবো বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমার মুক্তাগাছায় যাবার প্রশ্নই আসে না।

আমাকে উপন্যাসের কাজে হাত দিতে হবে দ্রুত। সাফায়েত ভাইকে কথা দেওয়া হয়েছে— সাত দিনের মধ্যে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হবে। একটা জুৎসই প্লট খোঁজা বাদ দিয়ে আমার পক্ষে এখন মুক্তাগাছা যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না।

আবার আমার হাতে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের দেওয়া তিন হাজার টাকা। এই টাকাটাও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

কী করবো ভাবছি, এমন সময় গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ড্রাইভার আকবর হোসেন বললেন, উঠেন স্যার, উঠেন। ভয় পাবেন না। আমি আছি না?

আমি বললাম, এখানে ভয় পাবার কী আছে?

ড্রাইভার সাহেব বললেন, ভাই, সতেরো বছর ধরে লাশের গাড়ি চালাই। কত দেখলাম! পোলা বাপের লাশ নিয়ে, স্বামী স্ত্রীর লাশ নিয়ে গাড়িতে উঠতে ভয় পায়– এরকম কত হাজার কাহিনি আমার দেখা। তাই বললাম, আর কী। আপনি আবার কিছু মনে কইরেন না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, সতেরো বছর ধরে লাশের গাড়ি চালানো লোকের পাশে বসে মুক্তাগাছা পর্যন্ত জার্নিটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবার কথা। এই লোকের কাছেও প্রচুর গল্পের প্লট পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে। না পেলেও সমস্যা নাই। আমি এমনিতেই নানা ধরনের গল্পের গন্ধ পাচ্ছি। মুক্তাগাছা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে গল্পের আরও নানা ডালপালা গজাতে পারে।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আপাতত গাড়িতে উঠে যাত্রা শুরু করি। আকবর হোসেন থেকে গল্প বের করতে বড়োজোর টঙ্গি বা গাজীপুর। সেই পর্যন্ত গিয়ে কোনো এক অজুহাত বানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়া যাবে।

ড্রাইভার আকবর হোসেনের গালে লম্বা দাঁড়ি, পরনে লম্বা আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, চোখে সুরমা। আমি নিশ্চিত, কাছে গিয়ে শুঁকতে পারলে ফুটপাত থেকে কেনা সস্তা দরের আতরের গন্ধও পাওয়া যাবে।

এসব পোশাক আশাকের কারণে উনার চেহারার মধ্যে একটা সুফি ভাব আছে। দেখলেই কেমন যেন পীর সাহেব– পীর সাহেব মনে হয়। মোটেও সাধারণ ড্রাইভার মনে হয় না।

সালাহউদ্দিন ভাই ড্রাইভার আকবর হোসেনকে বলেছিলেন, গাড়ির ইমারেজেন্সি লাইটটা জ্বালিয়ে রাখতে যেন পেছনের সব গাড়ি ফলো করতে পারে।

গাড়ি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাইভার সাহেব ইমারজেন্সি লাইট অফ করে দিলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই বাকি সবগুলো গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দিছি সবগুলারে খালাস কইরা। যাহ্, তোরা তোগোর মতো যা। একসাথে যাওয়ার আলগা খাতির দেখানোর জায়গা পায় না শালারা। নিজেরা আপনা লোক হইয়া, লাশের সঙ্গে যাবার সাহস পাইলো না একজনও– আপনারে কেমন জোর কইরা তুইলা দিলো– আর পিরিতি দেখায় সব গাড়ি একসাথে যাবার। যা এখন, লাশের গাড়ি খুঁইজা মর।

আমি বললাম, আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছে এটা আপনি বুঝলেন কীভাবে?

ভাইজান, এত বছর হইলো লাশের গাড়ি চালাই, মরাবাড়ির কিচ্ছা কাহিনি একবার তাকাইলেই দেখতে পাই– মাথা খাটাইয়া বুঝতে হয় না, নেন পান খান একটা।

এই বলে আকবর হোসেন সাহেব আমার দিকে একটা পান এগিয়ে দিলেন।

পান খাওয়া তার নেশা। কিছুক্ষণ পরপর তিনি পকেট থেকে একটা পোটলা বের করে তার ভেতর থেকে পান বের করে মুখে দিচ্ছেন। আধাঘণ্টার মধ্যে এটা তার দ্বিতীয় পান। আমি আড়চোখে তার পোটলার দিকে তাকিয়ে বুঝেছি, পোটলায় কমসে কম বিশ পঁচিশটা পান আছে।

আমি পান খাই না। লোকে কেন খায় সেটাও বুঝি না। পান পছন্দ না করলেও পানের আরেকটা সুন্দর নাম আছে, যেটা আমার খুব পছন্দের। পানের সংস্কৃত নাম - 'নাগবল্লরী'।

এই নামের পেছনে জড়িয়ে আছে মহাভারতের ইতিহাস।

যদিও পান আসলে একটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক খাদ্য। ইন্দো-আরিয়ান নয়। এর আদি ঠিকানা ফিলিপিন্স কিংবা জাভা। কিন্তু ভারতীয় অঞ্চলের লোকজনও পানকে তাদের একান্ত দেশি খাদ্য মনে করে।

আর এমন ধারণার কারণ মহাভারত। কারণ মহাভারতে দেখা যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পঞ্চপাণ্ডব নাকি পানের জন্য দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলেন। হস্তীনাপুর ছাড়িয়ে লোকজন নানা দিকে পানের খোঁজে নেমে পড়ে। কিন্তু কোথাও পান পাওয়া যায় না।

খুঁজতে খুঁজতে পান-সন্ধানীরা পৌঁছান পাতালপুরীতে। তখন সর্পরাজ বাসুকী নাকি পুরো ঘটনা শুনে তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে উপহার দেন তাঁরই হাতের কনিষ্ঠ আঙুল। সেই আঙুল মাটিতে পোঁতার পর জন্ম নেয়

এমন এক গাছ যে গাছের ফুল বা ফল কোনটাই নেই। আছে শুধু কচি সবুজ পাতা।

সর্পরাজ বাসুকীর দেহাংশ থেকে জন্ম নেবার কারণেই সংস্কৃতে পানের আর এক নাম হয়েছে 'নাগবল্লরী'।

ভাবলাম ড্রাইভার আকবর হোসেনের সাথে পান বিষয়ক এই জ্ঞানগর্ভ লেকচারটা দিয়ে কথাবার্তা শুরু করলে কেমন হয়? আমি যে একজন একজন অতি উচ্চমানের জ্ঞানী লেখক এই পরিচয়টা শুরুতেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

তার বাড়িয়ে দেওয়া পানের দিকে তাকিয়ে আমি তাই মজা করে বললাম, খেতে পারি, যদি পানের একটি সুন্দর সংস্কৃত নাম আছে–সেটা আপনি বলতে পারেন।

ড্রাইভার আকবর হোসেন একটা খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি দিয়ে বললেন, হে হে হে, এইটা আমি জানি স্যার।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনি জানেন?

জি স্যার। পানের আরেক নাম নাগ-বল্লরী।

সত্যি বলছি, এই মুহূর্তে গাড়ির পেছনের কেবিন থেকে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মৃত শ্বশুর সাহেব জেগে উঠে যদি আমাকে বলতেন, তমাল, একটা পান দাও তো দেখি?– তা হলেও বোধহয় আমি এতটা আশ্চর্য হতাম না যতটা আশ্চর্য হলাম আকবর হোসেনের মুখ থেকে 'নাগ-বল্লরী' শুনে।

অবাকের মাত্রা কিছুটা কমলে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথমেই আমি ড্রাইভার আকবর হোসেনের বাড়িয়ে ধরা পানটা নিয়ে মুখে দিলাম। এত কঠিন ধাঁধার উত্তর দেবার পর, প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করাটা উচিৎ হবে না।

পানটা মুখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি 'নাগ-বল্লরী' কীভাবে জানলেন?

আকবর হোসেন আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলো, বলেন তো দেখি স্যার কেমনে পারলাম?

এই লোক দেখি আমাকে পালটা ধাঁধা ছুড়ে দিচ্ছে। না, আকবর হোসেন সাহেবকে আন্ডার এস্টিমেট করা একদম ঠিক হয় নাই।

আমি বললাম, সে জন্য আপনাকে আমার জানতে হবে। আপনার সাথে সময় কাটাতে হবে, কথাবার্তা বলতে হবে।

সমস্যা নাই স্যার। যত ইচ্ছা সময় নেন– যত ইচ্ছা গল্প করেন। গল্প করা ভালো। অনেক দূরের রাস্তা, গল্প না করলে গাড়ি চালাইতে চালাইতে ঘুম চইলা আসতে পারে।

আমি নিশ্চিত ড্রাইভার আকবর হোসেন অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার। যে লোক সতেরো বছর ধরে লাশের গাড়ি চালায়– তার কাছেও অনেক স্টোরি থাকবে। থাকতে বাধ্য।

এই মুহূর্তে আমি দু দুটো সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম সিদ্ধান্ত, ড্রাইভার আকবর হোসেন সাহেব হবেন আমার এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ক্যারেক্টার। প্রথম ক্যারেকটার হলো সালাহউদ্দিন ভাই।

আর সিদ্ধান্ত নম্বর দুই, মাঝরাস্তায় নেমে যাবার ইচ্ছেটা পাল্টে মুক্তাগাছা পর্যন্ত যাওয়াটাই ঠিক করলাম। কারণ এই মুহূর্তে আমি অলরেডি অতি উচ্চমানের দুজন চরিত্র পেয়ে গেছি। এ দুজনের সাথে আরও দু একটা চরিত্র জোড়া দিতে পারলেই একটা ভালো গল্পের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। মুক্তাগাছা পর্যন্ত যাওয়া হলে দু একটা চরিত্র না, আরও বেশি চরিত্রের দেখাও পেয়ে যেতে পারি।

নাহ, এখান থেকে ঢাকা ফেরত চলে যাওয়াটা একদম উচিৎ হবে না। তারচেয়ে বরং দেখি এই গল্প আমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

আমাকে চুপচাপ পান খেতে দেখে ড্রাইভার আকবর হোসেন বললেন, পান খাইতে কেমন লাগতেছে স্যার?

আমি বললাম, ভালো।

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সিগারেট খাবেন? পানের সাথে একটা সিগারেট খাবার মজাই আলাদা।

এরকম একজন হুজুর টাইপ লোক থেকে যে সিগারেটের অফারও আসতে পারে– ভাবিনি।

তাকিয়ে দেখি একটা বেনসনের প্যাকেট তিনি আমার দিকে এগিয়ে ধরেছেন। এবার আর অফার ফিরিয়ে না দিয়ে, আমি একটা সিগারেট নিয়ে ধরালাম।

সিগারেটে প্রথম টান দিতেই খেয়াল হলো, কিছুক্ষণ আগে মাগরিবের সময় চলে গেলেও, ড্রাইভার আকবার হোসেন নামাজের জন্য গাড়ি থামাননি।

এরকম পোশাকের একটা লোকের জন্য বিষয়টা বেমানান। তার মানে তিনি মোটেও ধার্মিক কেউ নন, এই পোশাক আসলে পুরাটাই তার ফ্যাশন। লাশবাহী গাড়ির ড্রাইভারের জন্য বেশ মানানসই ফ্যাশন, বলতেই হবে।

আমি মনে মনে আকবর হোসেনের ফ্যাশন সেন্সের প্রশংসা না করে পারলাম না। কারণ এভারেজ বাঙালির ফ্যাশন সেন্স খুব খারাপ। গাজীপুর শালবনে পিকনিকে কিংবা কক্সবাজার সি বিচে সমুদ্র দর্শনে যাবার সময়েও বাঙালি পুরুষ পরে স্যুট-টাই আর মহিলারা পরে কাতান শাড়ি। বাস ট্রেনের লং জার্নিতেও কাতান এবং স্যুট বেশ পপুলার এদেশে।

ইনফ্যাক্ট আবহাওয়া বিচার করলে স্যুট পোশাকটাকেই আমার কাছে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেমানান পোশাক মনে হয়। যে এলাকার সারা বছরের গড় তাপমাত্রা ত্রিশের উপরে, সে এলাকার লোকজন স্যুট-টাই পরে কেন ঘুরবে, আমি কারণ খুঁজে পাই না? ইংরেজরা পরে বলে?

ইংল্যান্ডের আবহাওয়া যদি আমাদের দেশের মতো হতো তা হলে সেই ফরমুলায় সারা বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক হতো নিশ্চয়ই লুঙ্গি। আহারে, বেচারা লুঙ্গির জন্য মায়া লাগছে। অল্পের জন্য বেচারার কপালে সারা দুনিয়ার জনপ্রিয় পোশাকের মর্যাদাটা জুটলো না।

কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙে আকবর হোসেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইজান আপনি করেন কী?

আমি একটু হাসি দিয়ে বললাম, তেমন কিছু না। এই টুকটাক লেখালিখি করি।

তাই নাকি? মাশা আল্লাহ। তা কোথায় লেখেন? ইত্তেফাকে নাকি?

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দৈনিক ইত্তেফাকের কথা কেন বলছেন?

উনি বললেন, ছোটো বেলায় দেখছি পত্রিকা বলতে একটাই নাম আছিলো- দৈনিক ইত্তেফাক। বিকাল বেলায় আমাগো শহরে পত্রিকা পৌঁছাইতেই দৌড়াইয়া যাইয়া টারজান কার্টুন পরতাম, আর সিনেমার অ্যাডভেটাইজ দেখতাম। পত্রিকাটা এখন আর চলেনা বেশি।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার এই দুর্দিনের জন্য আকবর হোসেন সাহেবের মন একটু খারাপ মনে হলো।

আমি বললাম, না কোনো পেপারে পত্রিকায় আমি লিখি না।

তাইলে কোথায় লেখেন স্যার?

আমি একটু রসিকতা করে বললাম, দৈনিক ফেসবুকে।

আমার উত্তর শুনে আকবর হোসেন সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। খুব সম্ভবত তিনি আমার ফাজলামোটা বুঝতে পেরেছেন।

এই সময় গাড়ি একটা গর্তে পড়ে তীব্র ঝাঁকুনি খেলো। আমি কিঞ্চিৎ ভয় পেলে গেলাম। ড্রাইভাররা কি ফাজলামোর প্রতিশোধ এভাবে নেয় নাকি? দ্রুত তাকে ম্যানেজ করার জন্য আমি এবার বললাম, না... মানে... আমি বলতে চেয়েছে দৈনিক ই লিখি। ফেসবুকে।

ওহহ, কমা ভুইলা গেছেন?

জি? কী কমাতে ভুলে গেলাম?

উনি বললেন, আরে কমানো না। কমানো না। 'দৈনিক' আর 'ফেসবুকের' মাঝে যে কমা (,) আছে সেইটা বলতে ভুইলা গেছেন। তাই তো?

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললান, জি জি। একদম ঠিক। কমা ভুলে গেছিলাম। আমি লিখি দৈনিক কমা ফেসবুকে। ভাবলাম এবার যদি তার রাগ একটু কমে।

মনে হয় রাগ কমেছে। কারণ তিনি আবার কথোপথন শুরু করলেন।

আকবর হোসেন বেশ আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা, কী ধরনের লেখা লেখেন স্যার? গল্প, কবিতা নাকি নিউজ? বিষয়বস্তু কী?

আমি বললাম, বিষয়বস্তু তেমন গভীর কিছু না। 'সস্তা ধরনের হিউমার' করি আর কি।

বাহ্ বাহ্। এইটা তো বিরাট ব্যাপার। আজকাল এসব মানবিক ব্যাপার নিয়ে আর কে লেখালিখি করে, বলেন? খুব খুশি হইলাম, স্যার। খুব খুশি হইলাম।

আমি একটা গলা খাকারি দিয়ে বললাম, না মানে, বিষয়টা হিউম্যানিটি না। হিউমার।

আকবর হোসেন বললেন, ওই হইলো আর কী। একই কথা।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, হুম। কথা তো একই। আজকাল হিউম্যানিটি তো একধরনের হিউমারই।

গাড়ি টঙ্গী আসা মাত্র ভয়াবহ জ্যামে পতিত হলো।

আজকাল গাজীপুর চৌরাস্তায় শুরু হওয়া জ্যাম ঢাকার মহাখালি পর্যন্ত চলে আসছে। সেদিন বনানী থেকে উত্তরা পৌঁছাতে আমার তিন ঘণ্টা লেগেছে। কী ভয়াবহ একটা অবস্থা!

গাজীপুরের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে সেই কবে, ১০-১২ বছর ধরেই তো মনে হয় দেখছি, এখনো অর্ধেক কাজও হয় নাই। সত্যি বলতে এই কাজের গতির শম্বুক অবস্থা দেখে আমার এদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উপর আস্থাটাই উঠে যাবার অবস্থা হয়েছে। দেশ মারাত্মক ইঞ্জিনিয়ারিং ফেইল্যুরের মধ্যে আছে।

এইচএসসির পরে দেশের সায়েন্স পড়ুয়া সবচেয়ে মেধাবীদের মধ্য থেকে অর্ধেক যায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, বাকি অর্ধেক যায় মেডিক্যালে। আমার দৃষ্টিতে প্রফেশনাল লাইফে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি অবদান হিসেব করলে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের চেয়ে মেডিক্যাল সেক্টর অনেক ভালো করেছে।

অসহনীয় জ্যামের মধ্যে বসে আছি। সাধারণত ইদের ছুটিতে এরকম জ্যাম হয়। আমার মনে হলো গাজীপুর চৌরাস্তা পৌঁছাতেই, রাত দশটা বেজে যাবে। আর মুক্তাগাছা পৌঁছাতে পৌঁছাতে হবে গভীর রাত।

অবশ্য তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমার সময়ের কোনো অভাব নেই। আমি বরং লাশের গাড়িতে ভ্রমণ ব্যাপারটাতে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ বোধ করছি। এই অভিজ্ঞতা সবার হয় না।

লাশের গাড়িতে আমার অভিজ্ঞতা আজই প্রথম। এর আগে এধরনের যাত্রা নিয়ে নানা ভৌতিক ঘটনা হয় শুনেছি।

ভূত এফএম নামে রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম হয়। আরজে রাসেল নামের এক লোক সেই প্রোগ্রামে নানাবিধ ভূতের গল্প বলে থাকেন। সেই প্রোগ্রামে এরকম দু-একটা গল্পও শুনেছিলাম। আজ কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটবে? ঘটলে খারাপ হতো না। হয়তো আমার গল্পের নতুন কোনো রসদ পাওয়া যেত।

ছোটো খালাকে একটু ফোন করা দরকার। লাশের গাড়ি নিয়ে মুক্তাগাছা যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে জানানো দরকার। জানালে 'এক্সট্রা ডিউটি' বাবদ তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু টিএ-ডিএ টাইপ অ্যালাউন্স পাওয়া যেতে পারে।

হ্যালো খালা?

কীরে? কী খবর? কোথায় তুই?